অমৃতধারা : গীতা ও কথামৃত

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে যে-স্তোত্রগুলি রচনা করেছেন সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল,

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা
অধ্যক্ষা, বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ।" এই স্তবের একটি স্তবক—"গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ/ সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥"—কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের বিধ্বংসী হুঙ্কারকে স্তব্ধ করে যিনি শান্ত-মধুর গীতি সিংহনাদে গর্জন করে বলেছিলেন, সেই প্রথিত-পুরুষই আজ রামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে গীত সেই অমৃতগীতি হল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বহু যুগ অতিক্রম করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবার শান্ত সুর শোনা গেল। সেই সুরলহরী সিংহশক্তিতে আবার আমাদের চৈতন্যের জড়তা নাশ করে যুগযুগান্তরের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। প্রপন্নপারিজাত, তোত্রবেত্রৈক-পাণি, গীতামৃতদোহনকারী গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবারে নগর কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অমৃতকুম্ভ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর কথামৃতে জড়বাদ-ভোগবাদের দ্বন্দ্বে অশান্ত বিশ্বে অমিয়সিঞ্চন করে চলেছেন তিনি।

কথামৃত ও গীতামৃত—দুটি বাণীর সংকলনকেই 'অমৃত' বলা হচ্ছে। কারণ এই বাণীমালা আমাদের মৃত্যুহীন জীবনের দিকে নিয়ে যায়, আমাদের অমৃতমুখী করে। যুগ যুগ পেরিয়ে এখনও গীতা মানুষের মানসিক শক্তির অবলম্বন হয়ে আছে, কথামৃতের 'কথা' আমাদের চলার পথের শক্তি জোগায়।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদরা তাঁদের মনোরোগ নিরাময় পদ্ধতির সঙ্গে গীতার মিল খুঁজে পাচ্ছেন। যুদ্ধের আগে শোকে-দুঃখে মুহ্যমান অর্জুনের মনের অবস্থাকে একালের মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় বলা হবে Depression। Psychologist রা যেমন কথার কৌশলে মানুষের মনোবল ফিরিয়ে দেন,

গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ সেই কাজটিই করেছেন। তিনিও সুদক্ষ মনশ্চিকিৎসকের মতন অর্জুনকে বিষণ্ণতার পারে নিয়ে গেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি অবতার তাই তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতির কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই আমরা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক হিংসা, ক্রোধ, কুটিলতাময় পটভূমিতে দাঁড়িয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে শঙ্খ-ভেরি-ঢাক-মৃদঙ্গের তুমুল কোলাহলের মধ্যে বিষণ্ণ অর্জুনকে প্রথমেই আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে শুরু করলেন। পার্থসারথি বলে চললেন, ''হে অর্জুন, তুমি তো এই মরণশীল দেহ নও, তুমি যে স্বরূপত অমর আত্মা। ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—শরীর হত হলেও আত্মার মৃত্যু হয় না। তাই—ন ত্বং শোচিতুমর্হসি—তোমার শোক করা উচিত নয়।'' কথায় কথায় অর্জুনের মন ধীরে ধীরে এক নির্লিপ্তির ভূমিতে পৌঁছয়। অর্জুনের মনটিকে জগদতীত এক উচ্চভূমিতে আরূঢ় করানোর পর কৃষ্ণ অতি সাধারণ বোধগম্য ভাষায় বোঝাতে শুরু করেন, ''পার্থ, এ-যুদ্ধ ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। ধর্মযুদ্ধ না করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মবিরুদ্ধ কাজ'' ইত্যাদি। এই কথাগুলি কি তিনি প্রথমেই বলতে পারতেন না অন্যান্য মনস্তত্ত্ববিদদের মতন? সেক্ষেত্রে কী প্রতিক্রিয়া হত আমরা জানি না, কিন্তু অবতারের চিকিৎসা এতই অব্যর্থ যে সাধারণ চিকিৎসাপদ্ধতিতে যেখানে বারেবারে প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে নিয়মিত ডাক্তারের কাছে Counselling Session-এ বসার পদ্ধতির মাধ্যমে মনের চিকিৎসা চলে, যে-চিকিৎসায় রোগীর সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বছরের পর বছর কেটে যায়, সেখানে গভীর বিষাদাচ্ছন্ন অর্জুনকে নিজের স্বাভাবিক মননে ফিরিয়ে আনতে শ্রীকৃষ্ণের সময় লাগল কিছু ঘণ্টা মাত্র। এই কাজটি করতে পারেন একমাত্র অবতারপুরুষ তাঁর বচনামৃতের সাহায্যে।

এই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দেখি দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত অধর সেন তাঁর বন্ধু সারদাচরণকে নিয়ে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। সারদাচরণের বড় ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে। সেই দুঃসহ পুত্রশোকে কাতর সারদা কোথাও সান্ত্বনা পাচ্ছেন না। অশান্ত-বিষণ্ণ বন্ধুকে অধর নিয়ে এসেছেন তাঁর নিজের প্রাণের আরাম, মনের আশ্রয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে। বন্ধুর দুঃখের কথা ঠাকুরকে জানালেন অধর। কিন্তু কী আশ্চর্য! এ প্রসঙ্গে একটিও সান্ত্বনাবাক্য না বলে শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরলেন। তিনি গাইতে লাগলেন, 'জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।' সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে—আর সেই ভাবগম্ভীর সুর এমন এক নিরাসক্তির আবহ সৃষ্টি করে যে সারদাচরণের মনও নিশ্চয়ই নির্লিপ্ত ত্যাগের আকাশে বহুদূর উচ্চতায় উঠে গিয়েছিল। ওই উচ্চতা থেকেই অবতার তাঁর একান্ত অবতারসুলভ পদ্ধতিতে বলতে থাকেন, ''কি করবে? এই কালের জন্য প্রস্তুত হও। কাল ঘরে প্রবেশ করেছে, তাঁর নামরূপ অস্ত্র লয়ে যুদ্ধ করতে হবে, তিনিই কর্তা। আমি বলি, যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও তেমনি বলি; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী...।'' সেই অসীমে নিয়ে চললেন অত্যন্ত শোকদগ্ধ পিতাকে যেখানে, 'কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।' তারপর বড় দরদি কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, ''তা শোক হবে না গা? আত্মজ!'' মনকে নির্লিপ্তভূমিতে তুলে নিয়ে বিষাদ দূরীকরণের এই পদ্ধতি আমরা গীতা এবং কথামৃত দুয়েতেই দেখতে পাই।

অবতার অবতরণলীলায় সবসময় তাঁর স্বরূপকে আবৃত রাখেন না—উপযুক্ত আধারের সামনে প্রকাশ করেন। নইলে যিনি অমেয়, অপ্রমেয়—ক্ষুদ্র মানুষের তাঁকে ধারণা করার সাধ্য কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন গীতায়—'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' কথামৃতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন,

''দেখলাম, খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, আমিই যুগে যুগে অবতার!... দেখলাম, পূর্ণ আর্বিভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।''

কথামৃতে বারেবারে ঠাকুর বলছেন, ''গীতা কি? না দশ বার গীতা বললে যা হয় অর্থাৎ ত্যাগী ত্যাগী।'' কত সহজভাবে গীতার অর্থ বোঝাচ্ছেন ঠাকুর—গীতার মূল কথা হল অনাসক্ত হওয়া। কী বিষয়ে অনাসক্তি? কাম-কাঞ্চনের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ আমাদের বারেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে, তাই কামকাঞ্চনে, সংসারে আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। এই নিরাসক্তির উদাহরণ দিচ্ছেন, ''সংসারে থাকো, যেমন বড়মানুষের বাড়ির ঝি। সব কাজ করে, ছেলে মানুষ করে, বাবুর ছেলেকে বলে আমার হরি, কিন্তু মনে মনে বেশ জানে, এ বাড়ি আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয়। সে সব কাজ করে, কিন্তু মন দেশে পড়ে থাকে। তেমনি সংসারে সব কর্ম কর কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখো। আর জেনো যে, গৃহ, পরিবার, পুত্র—এ-সব আমার নয়, এ-সব তাঁর। আমি কেবল তাঁর দাস।'' গীতার কর্মযোগের অর্থ কথামৃতে ছবির মতো স্পষ্ট হয়।

দুর্নিগ্রহ মনকে বশে আনা সাধকের সব থেকে বড় তপস্যা। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ''অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।/ অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥'' নানাভাবে কথামৃততে আমরা দেখি শ্রীরামকৃষ্ণদেব অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন। সার্কাসে ঘোড়ার পিঠে একপায়ে বিবি দাঁড়িয়ে আছে আর ঘোড়া বনবন করে গোলাকার পথে দৌড়চ্ছে। ঠাকুর বলছেন, ''দেখলে, বিবি কেমন একপায়ে ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়া বনবন করে দৌড়ুচ্ছে! কত কঠিন, অনেকদিন ধরে অভ্যাস করেছে, তবে তো হয়েছে!'' অন্য এক জায়গায় এ-বিষয়ে গীতার কথা উল্লেখ করেছেন, ''অভ্যাসের দ্বারা কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায়। গীতায় একথা আছে।''

জ্ঞানীর পরাকাষ্ঠা হিসাবে গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের উল্লেখ আছে। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ মুনির সামনে যদি ভোগের জিনিস আনা হয়, তাহলে কচ্ছপ যেমন বিপদের আশঙ্কায় নিজেকে তার খোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে ঠিক তেমনই তিনিও নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংবরণ করে নিতে পারেন। ''যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।/ ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥'' যেন দ্বাপরের অবতরণলীলার স্মৃতিতে কলিযুগে যখন কথা-অমৃত বলে চলেছেন, তখনও ওই পুরনো উদাহরণেরই উল্লেখ করলেন ভগবান। ''অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে, তখন ইন্দ্রিয় সংযম করতে—কাম, ক্রোধ বশ করতে—কষ্ট হয় না। যেমন কচ্ছপ হাত-পা টেনে নিলে আর বাহির করে না; কুড়ুল দিয়ে চারখানা করে কাটলেও আর বাহির করে না।''

অভ্যাস বা সাধনা কোলাহলের মধ্যে হয় না। তার জন্য নির্জনতা চাই। গীতায় ভগবান বলেছেন, ''যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।/ একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।'' যোগী জনহীন স্থানে একা সমাহিত হওয়ার চেষ্টা করবেন। কথামৃতে ভগবান এই নির্জনতার ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন স্পষ্টভাবে—''ধ্যান করবে মনে, কোণে, বনে।'' কোলাহলমুখর নগরীতে সবসময় কাঙ্ক্ষিত নির্জন পরিবেশ না পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একফালি নির্জন স্থানের যদি ব্যবস্থা করা যায়, সেটিও কার্যকরী। তাও যদি না জোটে, তাহলে মনে একা হতে হবে। আবার উদাহরণ দিচ্ছেন, দই মন্থন করে মাখন তুলতে গেলে নির্জনতার দরকার। দধিমন্থন যথেষ্ট পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ, নির্জনে কাজটি করতে হয়। একইভাবে ঈশ্বরের জন্য সাধনা করতে হবে নির্জনে, গোপনে, একাকী।

কোনও কোনও স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গীতার মত উদ্ধৃত করে অতি সরল ভাষায় তার ব্যাখ্যা করছেন। গীতায় বলা হয়েছে, ''যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।/ তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।''—জগতে যা কিছু ঐশ্বর্য বা শক্তিবিশেষ দেখা যায়, তা সবই আমার শক্তির অংশ। ঠাকুর বলছেন, ''আবার যে ভাল গায়, ভাল বাজায়, কোন একটা বিদ্যা খুব ভালরকম জানে, তার ভিতরেও সার আছে। ঈশ্বরের শক্তি আছে। এটি গীতার মত।'' ''গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে-মানে—তা বিদ্যার জন্যই হউক, বা গান-বাজনার জন্যই হউক, বা লেকচার দেবার জন্যই হউক, বা আর কিছুর জন্যই হউক—নিশ্চিত জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।'' গীতার শ্রীরামকৃষ্ণব্যাখ্যায় আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি যে ঈশ্বরীয় শক্তির প্রকাশ সর্বত্র হতে পারে। গান, বাজনা, লেকচার—যেগুলি নিছক জাগতিক কর্ম—সেগুলিতেও ঈশ্বর প্রকাশিত হন।

একইরকমভাবে, মৃত্যুকালীন কর্তব্য প্রসঙ্গেও গীতার ভাব অতি সরলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর। গীতায় বলা হয়েছে, ''যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।/ তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥''—যিনি মৃত্যুকালে যাকে চিন্তা করে দেহত্যাগ করবেন, তিনি তাকেই প্রাপ্ত হবেন। অতি সুললিত বাচনভঙ্গিতে গীতার এই মতটি ব্যাখ্যা করেছেন ঠাকুর : ''গীতার মত, —মৃত্যুকালে যা ভাববে তাই হবে। ভরত রাজা 'হরিণ' 'হরিণ' করে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। তাই জপ, ধ্যান, পূজা এ-সব রাতদিন অভ্যাস করতে হয়,—তাহলে মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা আসে—অভ্যাসের গুণে। এরূপে মৃত্যু হলে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়।''

বহুস্থানেই দেখি কথামৃত ও গীতার ভাব এক হয়ে গেছে—একই বক্তব্য দুটি ভিন্ন ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে যেন। যথার্থ ভক্তের ভার ভগবান নেন, এ-প্রসঙ্গে গীতায় ভগবান বলছেন, ''তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।'' আবার কথামৃতে ভগবান বলছেন, ''যে ঠিক ভক্ত সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন। যে ঠিক রাজার বেটা, সে মুসোহারা পায়।''

ঈশ্বরপরায়ণ জীবনের শেষ কথা হল পূর্ণ শরণাগতি। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে তাত্ত্বিক-ব্যাবহারিক-দার্শনিক-আধ্যাত্মিক সবরকম আলোচনার অন্তে পার্থসারথি পার্থকে বলছেন,

''সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥''

—''সব ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও। আমি সব পাপ থেকে তোমায় মুক্ত করব।'' ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এই একই কথা বারেবারে বলেছেন, ''তাই বলছি—তাঁর শরণাগত হও—তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে?''

গীতা ও কথামৃতের মধ্যে আমরা আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছি, কারণ জীবনদায়ী সত্য চিরন্তন—তার কোনও পরিবর্তন হয় না। আর অবতার বারেবারে আসেন মানুষকে সেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। যুগাবতার যুগের ভাষায় সেই সত্যকে পরিবেশন করেন। তিনি উদাহরণ সংগ্রহ করেন সমকালীন পরিবেশ থেকে, তাই তা এত হৃদয়গ্রাহ্য হয়। সেজন্যই গীতামৃত যখন এযুগের নব অবতারলীলায় কথামৃতে পরিবেশিত হল, তখন তার জনাকর্ষণী শক্তি এত দুর্নিবার হয়ে উঠল।

শ্রীরামকৃষ্ণের অর্ধনিমীলিত চোখে ঘরে ফেরার ডাক, তাঁর মুখনিঃসৃত শব্দগুলি প্রতিটি এক একটি মন্ত্র, তাঁর সরল বাকশৈলী পরমজীবনের সন্ধান দিয়েছে অগণিত তাপিত মানুষকে। সেই মন্ত্রমালার আলোয় উজ্জ্বল পথে আমরা যেন নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারি—এই প্রার্থনা।